Vol. 47 | No. 2 | 2006

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আবু ইসহাকের গল্পের সমাজবাস্তবতা

Volume	47
Issue	2
Year	2006
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	এস এম মনির হোসেন
Published online	February 1, 2006
DOI	10.62328/sp.v47i2.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v47i2.9
Pages	149-160
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আবু ইসহাকের গল্পের সমাজবাস্তবতা

এস এম মনির হোসেন*

আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩) প্রবলভাবে জীবনবাদী ও সমাজসংলগ্ন কথাশিল্পী। সমকালমনস্কতা এবং তার রূপায়ণে বস্তুনিষ্ঠ নিরাসক্তি তাঁকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে। সমাজের অবহেলিত, উপেক্ষিত ও অতি সাধারণ মানুষের জীবন-ভাষ্য হিসাবে তাঁর গল্পগুলো সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। 'তাঁর ছোটগল্পে সমাজের উপেক্ষিত জনেরা অবলীলায় বেরিয়ে আসে। কুসংস্কারের বদ্ধ আবহাওয়ায় লালিত জীর্ণ সমাজ-জীবনকে তিনি তাঁর সহানুভূতির রসে সিক্ত করে অভিব্যক্তি দিয়েছেন।'[১]

আবু ইসহাকের গল্পগ্রন্থ দুটি, 'হারেম'[২] ও 'মহাপতঙ্গ'[৩]। তিনি মূলত গ্রামীণ জীবনের রূপভাষ্য নির্মিতিতে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল।[৪] গ্রামীণ জীবন ও জীবন অন্তর্গত সাধারণ মানুষের অস্তিত্ব অন্বেষার স্বরূপ চিত্রিত হয়েছে তাঁর গল্পে। গ্রামীণ মানুষের জীবনবোধ, জীবনাচরণ ও যাপিত জীবনকে তিনি নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর শিল্পীমানস বিকশিত হয়েছে এদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নাকে অবলম্বন করে। ফলে তাঁর গল্পে অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে ফুটে উঠেছে গ্রামীণ সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের অসহায়ত্ব, কুসংস্কার, অর্থনৈতিক শোষণ-নির্যাতন, সামাজিক বঞ্চনা এবং ব্যক্তিক অসঙ্গতির বহুমাত্রিক চিত্র। তিনি তাঁর গল্পে দেখিয়েছেন গ্রামীণ মানুষের সামর্থ্য আছে , আছে সম্ভাবনা কিন্তু এরা বন্দী এদের সংস্কারের কাছে, ধর্মান্ধতার কাছে, সমাজের ক্ষমতাধর ব্যক্তির কাছে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর কুসংস্কারের কারণে ক্রমেই এদের অসহায়ত্ব বাড়ছে এবং একটি বন্দী সমাজ প্রতিবেশের মধ্যে ক্রমেই এরা তলিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা, টাকা এবং ক্ষমতা একটি বিশেষ শ্রেণীর হাতে থাকবার কারণে এই অসহায় মানুষগুলো বন্দীদশা থেকে মুক্ত হতে পারছে না। তাই বলে এই গ্রামীণ-জনগোষ্ঠির জীবন নিস্তরঙ্গ নয়। সমস্ত অশুভের বিরুদ্ধে তারা লড়ে যাচ্ছে সোনালি ভোরের প্রত্যাশায়। এ কারণেই লক্ষ করা যায় 'ইতিবাচক জীবনবোধের আলোয় আবু ইসহাকের নায়কেরা সমস্ত অন্ধতা, কুসংস্কার আর শোষণের শৃঙ্খল ভেঙে একটি সুন্দর সমাজপ্রতিবেশ নির্মাণে হয়েছে জাগ্রত।'[৫]

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, টঙ্গী সরকারী কলেজ

আবু ইসহাকের গল্পে সরল ধর্মবিশ্বাস,ধর্মীয় অন্ধতা ও গোঁড়ামি, পীরদরবেশের প্রতি অন্ধবিশ্বাসের প্রসঙ্গ বারবার ঘুরেফিরে এসেছে । *কানাভুলা* গল্পে লেখক গ্রামের মানুষের সারল্য ও অজ্ঞতার সুযোগে গড়ে ওঠা পীর ব্যবসার প্রসঙ্গটি তুলে ধরেছেন। স্ত্রীর সন্তান প্রসবের কষ্ট লাঘবের প্রত্যাশায় স্বামী জাহিদ মায়ের পরামর্শে পানি-পড়ার জন্য পীরের কাছে ছুটে যায়। যাবার সময় পীরের কেরামতি সম্পর্কে জাহিদের মায়ের উচ্চারণ—

> ... তেনার পানি পড়া খাইলে বিনে কষ্টে খালাস অইয়া যাইব। — তার মা আবার বলে, তোর কাছে ট্যাকা আছে না? পাঁচটা ট্যাকা নজর দিস হুজুররে। আর হোন,হুজুরের মোখের কাছে বোতল নিস না। তেনার ফুঁ-এর তেজে কিন্তুক বোতল ফাইট্যা চৌখণ্ড অইয়া যাইব। (কানাভুলা, হারেম, পৃ. ১০-১১)

পীর দরবেশের প্রতি এ আস্থা বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে সংস্কার আচ্ছন্ন অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষের চিরায়ত বৈশিষ্ট্য। পীরের পানি পড়া নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে জাহিদ দেখে পীরের বাড়ি থেকে নার্স আর ডাক্তার বেরুচ্ছে। 'জাহিদ আশ্চর্য হয় । পীর সাহেবের বাড়িতেও তাহলে এদের দরকার হয়।' অথচ গ্রামের সহজ সরল ধর্মান্ধ মানুষ নিজেদের বিপদ-মুক্তির প্রত্যাশায় ছুটে যায় তথাকথিত পীরের কছে। মানুষের সারল্য এবং অন্ধতার সুযোগে যে পীর দোয়া ,পানি-পড়া ও তাবিজ-কবজ দিয়ে মানুষের রোগের চিকিৎসা করে টাকা উপার্জন করে, সে-ই আবার তার নিজের মেয়ের সন্তান প্রসবের জন্য মহকুমা শহরের ডাক্তার-নার্স বাড়িতে নিয়ে এসেছে।

জাহিদের স্ত্রী এবং পীর সাহেবের মেয়ের সন্তান প্রসবের দুটি চিত্র পাশাপাশি তুলে ধরে লেখক মূলত পীরব্যবসার অশুভ ও ভয়াবহ চিত্রই তুলে ধরেছেন এ গল্পে। তবে পাশাপাশি এ সত্যও ফুটে উঠেছে যে, এসময় ধর্মীয় অন্ধতা থেকে মানুষ কিছুটা হলেও সরে আসতে শুরু করেছে। জাহিদ পীরের পানি পড়ার পাশাপাশি লেডি ডাক্তারকেও বাড়ি নিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত লেডি ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। জাহিদের মা কিন্তু তখনো জানে যে, হুজুরের অছিলায় তার নাতি-নাতনি ঘরে এসেছে। মায়ের চাপে পড়ে একদিন মিষ্টি ও নজরানা বাবদ দশ টাকা নিয়ে পরিবারের সবাইকে নিয়ে জাহিদ রওয়ানা দেয় হুজুরের বাড়ির উদ্দেশে। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত জাহিদের রিক্সা গিয়ে পৌঁছে লেডি ডাক্তারের বাড়ি। জাহিদ তার বিবেক, বুদ্ধি ও স্বল্প-শিক্ষার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করেছে তার ফলে সে পারেনি অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হয়ে পীরের বাড়ি যেতে। সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবে এ গল্পে জাহিদের সিদ্ধান্ত বেশ গুরুত্বপূর্ণ।[৬]

বোম্বাই হাজী গল্পেও পীর ও মাজার ব্যবসার শেকড় অনুসন্ধান করেছেন আবু ইসহাক। সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাস ও সারল্যকে পুঁজি করে গ্রাম্য প্রধান ও পীর বা পীরের উত্তরসূরীরা কিভাবে মাজার ও পীর ব্যবসা টিকিয়ে রাখে তার চিত্র গল্পটিতে

চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ধর্ম ব্যবসায়ী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা যে একে অন্যের পরিপূরক ও সহায়ক হয়েই সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়-- তারই শিল্পিত ভাষ্য এই গল্প। এ প্রসঙ্গে বোম্বাই হাজীর পুত্র জাহানজেব ও সাবেদ মোড়লের কথাপোকথনের কিছু অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে—

> মোড়ল আবার বলেন, 'খবরদার, কাউয়া-শালিকেও যেন জানতে না পারে। আপনারে গদিতে বসাইতে না পারি তো আমি হাতে চুড়ি দিমু। আপনার বাপজানের আমলে অনেক মুরিদান চইল্যা গেছিল। দ্যাখবেন তারা আবার আপনের মুরিদ অইছে।'
>
> একটু থেমে মোড়ল আবার বলেন, 'উরুসের সময় তো আজকাল আর তেমন আয় হয় না। আমি এমুন ব্যবস্থা করতে আছি, দ্যাখবেন উরুসের আয় তিন ডবল বাইড়্যা গ্যাছে।'
>
> জাহানজেব বলেন, 'আগে তো দাফনের ব্যবস্থা করেন, তারপর—'
>
> 'সব অইব, সব অইব। তবে একটা আর্জি, মেলার খাজনা আদায়ের ভার দিতে অইব আমারে। যেই ট্যাকা আদায় অইব তার দশ আনা আপনার আর –।' কথা শেষ করেন না মোড়ল।...
>
> জাহানজেব ভেবে নেন কিছুক্ষণ । তারপর বলেন, 'আচ্ছা, দশ আনা ছয় আনাই ঠিক। আপনি ছয় আনাই পাইবেন।' (বোম্বাই হাজী, হারেম, পৃ. ৯২)

শয়তানের ঝাড়ু গল্পের প্রসঙ্গও পীর ব্যবসা। এ গল্পে আবু ইসহাক পীর দরবেশের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে সাধারণ সহজ-সরল মানুষের ভ্রান্ত বিশ্বাসে আঘাত করেছেন। পীর দরবেশের কেরামতিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন। পীর দরবেশের নামে প্রচলিত কিচ্ছা কাহিনীতে তিনি কোন বাস্তব ভিত্তি খুঁজে পান নি। তাঁর কাছে এগুলো কেবল ভোজবাজি বা যাদুবিদ্যা বলেই মনে হয়েছে। এগুলো যে কেবল যাদু বিদ্যা তা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন গল্পের প্রধান চরিত্র মোতাহারের মঞ্চে দর্শকের সামনে নানা ধরনের ম্যাজিক খেলা দেখাবার মাধ্যমে। লেখক মোতাহারের মাধ্যমে বোঝাতে চাচ্ছেন, আধুনিক কালে ম্যাজিসিয়ান বা যাদুকররা যে ধরনের ভয়াবহ খেলা দেখায় তার সঙ্গে পীরদের নামে প্রচলিত কেরামতির মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

দাদীর নদীদর্শন গল্পে ধর্মীয় অন্ধতা ও গোঁড়ামি এবং পর্দার প্রসঙ্গটি আবু ইসহাক চমৎকার ভাবে শিল্পায়িত করেছেন। জন্ম থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত দাদী কোনদিন বাড়ির বাইরে বের হন নি । চাচাত ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হবার কারণে ছ'হাত উঁচু প্রাচীর ঘেরা অন্দর মহলেই সারাটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন । সব ধরনের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অন্ধতার মধ্যেই তাঁর বসবাস, বাইরের আধুনিক জীবন জগৎ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ

অজ্ঞ। 'পুরেনো সব কিছুই' তাঁর কাছে ভাল লাগে। আধুনিক যে কোন বিষয়ের মধ্যেই তিনি হারাম এবং পাপ খুঁজে পান। নাম না জানা আধুনিক খাবার থেকে শুরু করে সবকিছুই তাঁর কাছে হারাম। বাংলা ইংরেজি শিক্ষা তাঁর মতে কুফরী এলেম। গত পঞ্চাশ বছরে তিনি বৈঠকখানায় পর্যন্ত যান নি ; পাছে 'বেগানা' কেউ দেখে ফেলে । দাদীর পর্দার গোঁড়ামির চিত্রাঙ্কন করেছেন লেখক এভাবে--

> 'একদিনের ঘটনা । দাদী চুল আঁচড়াচ্ছিলেন । সেটা দাদীর কাঁচা চুলের যুগ। বিয়ে তখোন হয়নি। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে খালি মাথায় তিনি সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর চাচাত ভাই মীর আদিল ঐ অবস্থায় তাঁকে দেখে ফেলেছিলেন। জানতে পেরে দাদী মাথা ন্যাড়া করে ফেললেন তক্ষুনি। পর-পুরুষের দেখা চুল রাখতে নেই, রাখলে প্রত্যেকটা চুল সাপ হয়ে কামড়াবে হাশরের দিন।' (দাদীর নদীদর্শন, হারেম, পৃ. ২২)

তাঁর অজ্ঞতা ও গোঁড়ামী এতটাই প্রবল যে তিনি মৃত্যু পথযাত্রী হয়েও ডাক্তারের চিকিৎসা নিতে অনিচ্ছুক। কারণ, তাঁর বিশ্বাস "হারাম জিনিস ছাড়া নাকি ওষুধই হয় না।"

পণ্ডশ্রম ও *পিপাসা* গল্পে লেখক এক শ্রেণীর বাঙালির ইংরেজি আদিখ্যেতা,ভুল ইংরেজি বলা ও মাতৃভাষা ছেড়ে অহেতুক ইংরেজি নিয়ে বাড়াবাড়ির বিষয় তুলে ধরেছেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে। '৪৭-এর দেশ বিভাগের পর থেকেই_ বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংস করার চক্রান্ত শুরু করে পশ্চিম পাকিস্তানিরা । এদের এই চক্রান্তে বুঝে-না বুঝে বাঙালিদের একটা অংশ পরোক্ষ ভাবে জড়িয়ে পড়ে । অনেকেই শিক্ষা-দীক্ষা ,কথা-বার্তায় বাংলার পরিবর্তে ইংরেজি ব্যবহারই যথার্থ বলে মনে করতে শুরু করে। বাংলা ভাষার প্রতি এদের অবজ্ঞা এবং অন্ধ ইংরেজি-প্রীতি আবু ইসহাককে পীড়িত করে। এদের ইংরেজি-প্রীতি প্রবল হলেও,ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের সামর্থ্য নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন আবু ইসহাক। তিনি *'পণ্ডশ্রম'* ও *'পিপাসা'* গল্পে তথাকথিত ইংরেজি প্রেমিকদের ভুল ইংরেজি বলা, মাতৃভাষা ছেড়ে অহেতুক ইংরেজি ভাষা নিয়ে বাড়াবাড়ি নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন। *'পিপাসা'* গল্পে পাকিস্তানের হায়দারাবাদের এক বাঙালি দম্পতির মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা এবং ইংরেজি প্রীতির চিত্র তুলে ধরেছেন তিনি। স্বামী মেহবুবের ইংরেজি প্রীতি এবং বাংলা ভাষার প্রতি সীমাহীন অবজ্ঞা স্ত্রী জোহরাকে কষ্ট দেয়। বাংলা ভাষার সঙ্গে জোহরা নাড়ির টান অনুভব করে। অথচ মেহবুব স্বামী-স্ত্রীর কথা-বার্তাও ইংরেজিতে চালাতে আগ্রহী। তার ইংরেজি প্রীতি এতটাই প্রবল যে , একমাত্র ছেলে আনোয়রকে সে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করতে দ্বিধা করে না। মেহবুবের মানসিকতাটি লক্ষণীয়—

> মায়ের মাতৃভাষা-প্রীতি ছেলের মধ্যেও সংক্রমিত হতে পারে, এ ভয় তার সব সময় ছিল।

> তাই কথা শেখার আগেই মায়ের স্নেহ-ক্রোড় থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ছ'বছর বয়স পর্যন্ত ছিল গবর্নেসের কাছে। তারপর চার বছর কেটেছে মারীর এক ইস্কুলে। এত করেও তিনি ছেলের মাতৃভাষা একেবারে কেড়ে নিতে পারেন নি। (পিপাসা, হারেম, পৃ. ৪৫)

পাকিস্তানের হায়দারাবাদে এক রকম নিঃসঙ্গ একঘেঁয়ে জীবন কাটে জোহরা বেগমের। তার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গী রেডিও ও কিছু বাংলা বই। কিন্তু এই রেডিওতেও বিরাট বৈষম্য দেখে সে ক্ষুব্ধ হয়। তার মানসিক যন্ত্রণাটি লক্ষণীয়—

> যে দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি বাঙলাভাষী, সে দেশের রাজধানীর বেতার কেন্দ্র থেকে রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টায় তিন মিনিটের একটি মাত্র বাঙলা গান দেয়া হয়। এ গানটির জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে করাচী আর পশ্চিম পাকিস্তানে প্রবাসী অগণিত বাঙালী। এমন স্পষ্ট আওয়াজে বাঙলা গান শোনার সৌভাগ্য আর তাদের হয় না। (পিপাসা, হারেম, পৃ. ৪৬)

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নগর মানুষের হীন-স্বার্থপরতার চিত্রও আবু ইসহাকের গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে। *বনমানুষ* গল্পটি '৪৭ সালের দেশ-বিভাগের পটভূমিতে রচিত। নগর জীবনের স্বার্থপরতা, কৃত্রিমতা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চিত্র শিল্পরূপ লাভ করেছে এই গল্পে। সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে মানুষ অসহায়। তাদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। যে কোন মুহূর্তে যে কেউ ঢলে পড়তে পারে মৃত্যুর কোলে। মানুষই আজ মানুষের চরম শত্রুতে পরিণত হয়েছে। কোন বন্য জন্তুর ভয়ে নয়, মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষেরই ভয়ে। এ প্রসঙ্গে লেখকের বর্ণনা লক্ষণীয় : শোন্, তোকে একটা ছবি আঁকতে হবে । মানুষের ভয়ে মানুষের চেহারা কেমন হয়, ফুটিয়ে তুলতে হবে সে ছবিতে। পারবি তো? (বনমানুষ, হারেম, পৃ. ৮৮)

বিস্ফোরণ গল্পে দরিদ্র অসহায় নিরন্ন মানুষ ও তাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। পাশাপাশি আর্থ-রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে হঠাৎ ধনী হয়ে যাওয়া পুজিঁবাদীদের শোষণ-নির্যাতন ও যৌনক্ষুধার চিত্র রয়েছে এ গল্পে। উঠতি ধনিক শ্রেণীর শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠবার প্রসঙ্গটিও রয়েছে গল্পের অন্তিমে। লঞ্চ মালিক আতাউল্লাহ্‌কে ইয়াসিনের আঘাতের মধ্য দিয়ে লেখক যেন নতুন সম্ভবনার ইঙ্গিত করছেন। সমাজ কাঠামোই শুধু নয় লেখক রাষ্ট্র কাঠামোর পরিবর্তনও যেন প্রত্যাশা করছেন অসহায়-দরিদ্র ইয়াসিনের ক্ষোভ ও আতাউল্লাহ্‌র উপর আক্রমণের মধ্য দিয়ে—

> ইয়াছিনের মাথায় রক্ত চড়ে যায়। সে ঝাঁপিয়ে পড়ে আতাউল্লাহ্ খাঁর ওপর।
>
> ইয়াসিনের বৈঠাটানা, মাটিকাটা পেশীবহুল শরীরের কাছে আতাউল্লাহ্ খাঁর মেদবহুল থলথলে সুখের শরীর তিষ্ঠোতে পারে না বেশীক্ষণ। ইয়াসিন তার বুকের ওপর

চেপে বসে। দুরাত্মা দুঃশাসনের বক্ষ বিদারণ করে ভীম তার রক্ত পান করবে বুঝি। (বিস্ফোরণ, মহাপতঙ্গ, পৃ. ২৪)

আবর্ত গল্পে সরল নিষ্পাপ দুটি জীবনের বিনষ্টির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। অসম অর্থনীতি নির্ভর গ্রামীণ সমাজের নিষ্ঠুরতার বলি গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নূরজাহান। সে ভালবেসেও বিয়ে করতে পারে নি দরিদ্র ইউনুসকে। ইউনুসের দারিদ্র্যের পেছনে ছিল মুসলিম উত্তরাধিকার আইন। দাদার পূর্বে পিতার মৃত্যুর কারণে ইউনুস সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়। পরবর্তীতে চাচা উমর আলী মোড়লের হাতে পায়ে ধরে এক বিঘা জমি পেলেও পুনরায় সে সম্পত্তি থেকেও তাকে বঞ্চিত হতে হয় উমর আলীরই প্রতারণার কারণে।'মোড়লের গ্রাম্য রাজনীতির কাছে হেরে যায় ইউনুস।'[৭] মোড়লের প্রবঞ্চনা ও লাম্পট্যের কারণে প্রেমিকা ও জমি দুই-ই সে হারায়। একাধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও মোড়ল বিত্তের জোরে নূরজাহানকে বিয়ে করে। কাঙ্ক্ষিত জীবন যাপনে ব্যর্থ নূরজাহান এক সময় উন্মাদ হয়ে হারিয়ে যায় সমাজ ও জীবন থেকে।

গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকেরা দিনের পর দিন পরিশ্রম করে অন্যের জমি চাষ করে। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে জমিতে সোনার ফসল ফলে। 'কিন্তু, হাড় ভাঙা খাটুনির এ ফসল কতোটা যায় কৃষকের ঘরে? জোঁকের মতো শোষণ করে নেয় মহাজন, জোতদার কিংবা ফড়িয়ারা সেই ফসল।'[৮] *জোঁক* গল্পে আবু ইসহাক ভূমিহীন কৃষকদের শোষিত ও নির্যাতিত হবার এই চিত্র তুলে ধরেছেন ওসমানের মধ্য দিয়ে। ওসমান নিরক্ষর ভূমিহীন কৃষক। সে অন্যের জমি বর্গাচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে অতি কষ্টে। ওসমান অর্ধাহারে অনাহারে থেকে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে অমানুষিক পরিশ্রম করে ফসল উৎপাদন করে।"এত পরিশ্রমের ফসল কিন্তু তার একার নয়। সে-ত শুধু ভাগচাষী।... দীর্ঘ সুপুষ্ট পাট গাছ দেখে যে আনন্দ হয়েছিল ওসমানের, তার অনেকটা নিভে যায় এসব চিন্তায়। একটা দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে সে ভাবে- আহা, তার মেহনতের ফসলে যদি আর কেউ ভাগ না বসাত!"[৯] অথচ ভূমি মালিকদের শোষণ-নির্যাতন আর বঞ্চনার কারণে সে তার প্রাপ্য অংশ থেকেও বঞ্চিত হয়। নিরক্ষর ওসমানকে প্রতারিত করে উৎপাদিত ফসলের দুই ভাগ নিয়ে নেয় ভূমি মালিক ওয়াজেদ চৌধুরীর ছেলে ইউসুফ। 'গল্পের বিষয়টি শোষক মহাজন ও শোষিত বর্গাচাষীদের চিরন্তন বিরোধের এক চমৎকার উপস্থাপনা।'[১০]

এই গল্পে আবু ইসহাক রূপক-প্রতীক আশ্রয়ী; জোঁকের প্রতীকে তিনি ভূমি মালিকদের শোষণ-নির্যাতনের চিত্র চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন। জোঁক যেমন নীরবে মানুষের রক্ত চুষে নেয় মহাজন-জোতদারও তেমনি অসহায় দরিদ্র কৃষকের অজান্তেই তাদের সর্বস্ব কেড়ে নেয়। এ প্রসঙ্গে ওসমান ও তার দশ বছরের সন্তান তোতার অভিব্যক্তি লক্ষণীয়—

> জোঁক হাঁটুর যেখানটায় চুমুক লাগিয়েছিল সেখান থেকে তখনও রক্ত ঝরছে। সে দিকে তাকিয়ে তোতা জিজ্ঞেস করে, বা'জান কেমুন কইর‍্যা জোঁকে ধরল তোমারে, টের পাও নাই?
>
> – না রে বাজান, এ গুলা কেমুন কইর‍্যা যে চুমুক লাগায় কিছুই টের পাওয়া যায় না। টের পাইলে কি আর রক্ত খাইতে পারে? (জোঁক, মহাপতঙ্গ, পৃ. ৭৭)

জোঁকের মতই ভয়ংকর ও ধুরন্ধর এই জোতদার-মহাজনরা। আইন করেও এদের ঠেকিয়ে রাখা দুষ্কর। কৌশলে এরা আইনকে পাশ কাটিয়ে দরিদ্র কৃষকের উপর এদের শোষণ-নির্যাতন অব্যাহত রাখে। তবে এক সময় ওসমানরা এই শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে জেগে ওঠে; প্রতিবাদী হয়ে আঘাত করতে এগিয়ে চলে চৌধুরী বাড়ির দিকে :

> তার (ওসমান) ঝিমিয়ে-পড়া রক্ত জেগে ওঠে। গা ঝাড়া দিয়ে সে বলে–হ, চল। রক্ত চুইষ্যা খাইছে। অজম করতে দিমু না, যা থাকে কপালে। (জোঁক, মহাপতঙ্গ, পৃ. ৮১)

মূলত 'শ্রেণীসংগ্রামের শিল্পভাষ্য হিসাবে 'জোঁক' গল্প আবু ইসহাকের প্রগতিবাদী জীবনবোধের পরিচয়বাহী।'[১১] লেখক এখানে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের শোষণের শৃঙ্খল ভেঙে একটি নতুন সমাজ-প্রতিবেশ বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত।

নিম্ন আয়ের কর্মচারীদের জীবন যন্ত্রণার সফল রূপায়ণ *প্রতিবিম্ব* গল্পটি। বরাবরের মতই এ গল্পেও লেখক গভীরভাবে জীবন ও সমাজ মনস্ক। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ব্যক্তির পরাভবের যন্ত্রণা, বিনষ্টি ও অসহায়ত্ব তাঁকে যে ব্যথিত করেছে তা এ গল্প থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। *'মাসের শেষে মরলে কাফনের কাপড় জুটবে না,'*-এই যাদের নিয়তি তাদেরকে অফিসের বড় কর্তার মর্জি মাফিক পোশাক বদলের প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। যোগ্যতার চেয়ে চাটুকারিতা এবং বড় কর্তার পছন্দের পোশাক পরাটাই চাকরীর স্থায়িত্বের ও উন্নতির প্রধান বিষয় হয়ে উঠলে নিম্ন আয়ের কর্মচারীদের জীবন কতটা দুর্বিষহ ও কষ্টকর হতে পারে, তার অনুপুঙ্খ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে প্রতিবিম্ব গল্পে। দ্রুত বদল হওয়া বড় কর্তাদের মেজাজ-মর্জি, মন-মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গিয়ে নিম্ন আয়ের বহু কর্মচারীর মত স্টোরকীপার নুর মোহাম্মদের জীবনে নেমে আসে করুণ পরিণতি। চাকুরী রক্ষা করতে গিয়ে চরম অর্থ কষ্টের মধ্যেও সে বারবার পোশাক বদল করতে বাধ্য হয়। জামা ছেড়ে শেরওয়ানী, আবার শেরওয়ানী ছেড়ে কোট পরিধানে বাধ্য হয়। কিন্তু এই কোটই হয় তার জীবনের করুণ পরিণতির কারণ। ভিন্ন মানসিকতার নতুন বড় কর্তা তাকে সন্দেহের চোখে দেখে।

> চীফ ম্যানেজার বোধহয় সন্দেহ করেছেন– পাঁচ পাঁচটা মানুষের ভার বহনকারী একশো টাকার মাইনের স্টোর-কীপার এই মাগগী-গণ্ডার বাজারে চুরি না করে স্যুট

> হাঁকায় কেমন করে এমন লোককে স্টোরে রাখলে সব মাল পাচার করে দেবে। (প্রতিবিম্ব, মহাপতঙ্গ, পৃ. ১০২)

তারপর একসময় তাকে চাকুরি থেকে ছাঁটাই করা হয়। অর্থ কষ্ট ও রোগে ভুগে তাকে পৃথিবী ছেড়েই চলে যেতে হয়। সংসারের সহস্র অভাবের মাঝে আরো অভাব বাড়িয়ে চাকুরী রক্ষার তাগিদে স্যুট কিনলেও সেই স্যুটই তার চরম পরিণতি ডেকে আনে।

গল্পের কথক নুর মোহাম্মদের মতই নিম্ন আয়ের কর্মচারী। বড় কর্তার আদেশ পালন করতে গিয়ে সংসারের অনেক অতি প্রয়োজনীয় খরচ বাদ রেখে সে একটি পুরোনো স্যুট কেনে। এই স্যুটটি নুর মোহম্মদেরই ছিল এটা জানার পর সে অস্তিত্ব সঙ্কটের যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়। তার ভবনা সূত্রটি লক্ষণীয়—

> ধনুর্দোলায় কোটটা ঝুলছে। একটা মাথা বেরিয়ে আসে কোটের ভেতর থেকে - একটা চেনা ফ্যাকাশে মুখ। চোয়ালের হাড় বেরিয়ে পড়েছে, চক্ষু কোঠরাগত। আস্তিনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে দুটি হাত। আঙ্গুলগুলোর মুদ্রাদোষ তার জীবিকার আভাস দেয়। এবার লোকটার পায়ের দিকটাও দেখা যায়। (প্রতিবিম্ব, মহাপতঙ্গ, পৃ. ১০৪)

আবু ইসহাকের গল্পের নায়কেরা বরাবরাই আলোর প্রত্যাশী, সুস্থ-সুন্দর ও মানবতাধর্মী সমাজ প্রতিবেশ নির্মাণে সদা তৎপর ও সংগ্রামশীল। তাদের এই সংগ্রাম অব্যাহত থেকেছে অন্ধতা, কুসংস্কার, শোষণ-নির্যাতন ও নিজের ভিতরের অপ-অস্তিত্বকামী সত্তার বিরুদ্ধে। *উত্তরণ* গল্পে লেখক রুস্তম চরিত্রের মাধ্যমে অশুভ সত্তা থেকে শুভ সত্তায় উত্তরণের এক শিল্পভাষ্য রচনা করেছেন। দরিদ্র রুস্তম তার উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন দুটি গরু হারিয়ে চোখে অন্ধকার দেখে। বেঁচে থাকার তাগিদে এক সময় লোক ঠকিয়ে দুধের ব্যবসা শুরু করে। ভেজাল দুধ বাড়ি বাড়ি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে সে। কিন্তু এই অপকর্মটি সে বেশি দিন করতে পারে না। একটি শিশুর কান্না তার সমস্ত জীবনচিন্তাকে পাল্টে দেয়-- তার ভেজাল দুধ খেয়ে বেড়ে উঠছে শিশুটি। 'ঐ শিশুর কান্না রুস্তমের মনে পরিবর্তন আনে এবং এর পর সে আর ভেজাল দুধের ব্যবসা করতে পারে নি।'[১২] সহায় সম্বলহীন রুস্তম ভেজাল দুধ বিক্রি বন্ধ করে দেয়। তার উত্তরণ ঘটে শুদ্ধ অস্তিত্ব জিজ্ঞাসায় :

> অনেক দিন পর আজ আবার রাস্তার তে-মাথায় গিয়ে দাঁড়ায় রুস্তম। তার কলসী খালি। কলসীর মুখে গামছা নেই। (উত্তরণ, মহাপতঙ্গ, পৃ. ১২১)

মহাপতঙ্গ আবু ইসহাকের একটি ব্যতিক্রমধর্মী গল্প। এক জোড়া চড়ুই পাখির দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পটি বর্ণিত হয়েছে। শ্রেণীবিভক্তহীন, শোষণমুক্ত, কল্যাণমুখী যে সমাজ প্রতিবেশ আবু ইসহাকের অন্বিষ্ট ছিল তারই শিল্পিত রূপায়ণ এ গল্প। এ গল্পে

লেখক বৈশ্বিক ও বিজ্ঞান মনস্ক। 'বিজ্ঞানের অবদান অনেক সময় আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপ হয়। প্রতীকধর্মী গল্প 'মহাপতঙ্গ' সে- লক্ষ্যেই রচিত।'[১৩] এখানে তিনি দেখিয়েছেন নব নব আবিষ্কারে মানুষ আজ সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। মানুষের অসাধ্য বলে আজ কিছু নেই। মানুষ চাইলেই মানুষের জন্য শুভ ও কল্যাণকর একটি পৃথিবী তৈরি করতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যেই পৃথিবীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে পারে। মানুষের প্রতি প্রবল আশাবাদ ব্যক্ত করে তাই লেখকের উচ্চারণ :

> পুরুষ চড়ুই বলে দো-পেয়ে দৈত্য সমস্ত দুঃখ-অশান্তি দূর করতে পারে। ওরা ইচ্ছে করলে আরও সুন্দর করতে পারে পৃথিবীকে। (মহাপতঙ্গ, মহাপতঙ্গ, পৃ. ১২৭)

লেখক তাঁর কাঙ্ক্ষিত পৃথিবীর বর্ণনা করছেন এভাবে :

> তখন ওরা সুন্দর পৃথিবীর গল্প শুরু করে দেয়। রঙ-রূপ-রসের বৈচিত্র্যে অপরূপ এ পৃথিবী। চন্দ্র-সূর্যের কর্তব্যনিষ্ঠায় আলোকোজ্জ্বল এ পৃথিবী। ফুল-ফল-শস্যের সম্ভারে সমৃদ্ধ এ পৃথিবী। দুঃখের তুলনায় অনেক সুখ এখানে। (মহাপতঙ্গ, মহাপতঙ্গ, পৃ. ১২৮)

আচার সর্বস্ব ধর্মের প্রতি আবু ইসহাকের অনাস্থা ছিল বরাবরই। *খুতি* গল্পে আকবর সাহেবের চরিত্রের মাধ্যমে লেখক তা তুলে ধরেছেন। আকবর সাহেবের মত লোকেরা মুখে কথায় কথায় ধর্মের কথা বলেন। লম্বা দাড়ি রাখেন। ইসলামি পোশাক পরেন। নামাজ-রোজা পালনেও সদা তৎপর। অথচ অর্থ উপার্জনের বিষয়ে তাদের যুক্তি যে কোন বিবেকবান ব্যক্তিকেই ব্যথিত করে। অর্থের সমাগম বৈধ-অবৈধ যে ভাবেই হোক না কেন-- তাকে বৈধতা দেবার জন্য এরা একটা যুক্তি দাঁড় করাবেই। মুখে ধর্মের কথা বললেও এদের ভেতরের কুৎসিত ও অন্ধকারময় দিকটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অবস্থাই তৈরি করে আমাদের সমাজ-রাষ্ট্রে। আকবর সাহেবকে চলনে-বলনে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান বলেই মনে হয়। অথচ ধর্মের মহৎ বাণী সে আত্মস্থ করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। ব্যক্তি স্বার্থেই সে ধর্মকে ব্যবহার করে। তার চরিত্রের স্ব-বিরোধের কিছু চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হল–

> ১. ওসব চাকর-বাকরের জবাই করা মোরগ আমাকে খাওয়াতে পারবে না, মা। ওরা না জানে দোয়া-কালাম, না জানে ওজু-গোসল। নামাজ দূরে থাক কেবলাই চিনে না। এসব বেনামাজীর জবাই গোশত হালাল হয় না।
>
> ২. রাত্রে খাবারে বসে পুত্রবধূকে অনেক খোশখবর দেন আকবর সাহেব। হালিমার ভাসুর আজমল ইনকাম ট্যাক্স অফিসার। সে ঢাকায় আর একখানা দোতালা বাড়ি কিনেছে। ওভারসিয়ার দেওর আকমল চাটগাঁয়ে জায়গা কিনেছে। আসছে শীতে বাড়ি তৈরি শুরু হবে। মাস কয়েক আগে সে বাড়ি এসেছিল। তখন জমি কিনেছে

দুই কানি। খতম জালালী ও মিলাদে পাঁচশো টাকা খরচ করে গেছে। ছোট বউ-এর জন্যে নতুন হার কঙ্কন গড়িয়েছে। এই ছেলে দুটির সাফল্য আকবর সাহেবের মনে প্রশান্তি এনে দিয়েছে।

৩. ...কেন? এটা ত ঘুষ নয়। কেউ খুশী হয়ে দিলে কোন দোষ নেই। (খুতি, মহাপতঙ্গ, পৃ. ২৭, ২৯, ৩০)

দুই ছেলের আয়ের সঙ্গে সম্পদের অসঙ্গতি আকবর সাহেবের মনে কোন প্রকার সন্দেহের উদ্রেক করে না। তাঁর দুই ছেলের উপার্জন কতটুকু হালাল এ ব্যাপারেও তাঁর মনে কোন প্রশ্ন দেখা দেয় না । অথচ তথাকথিত এই ধর্মপ্রাণ মানুষটির বেনামাজির হাতের জবাই করা মুরগী খেতে যত আপত্তি।

ধর্মের মমার্থ উপলব্ধিতে ব্যর্থ তথাকথিত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের নিয়ে বেশ কিছু গল্প লিখেছেন আবু ইসহাক। তাদের ধর্ম চিন্তার একটা বিশাল এলাকা জুড়ে থাকে কী করলে বেশি বেশি ছওয়াব লাভ করা যাবে। পরকালে শান্তিতে থাকা যাবে। এদের প্রতিটি কর্মের মধ্যেই লোভ কাজ করে। এদের ধর্ম-কর্ম, দান-দক্ষিণার মধ্যে মানবতার সেবা বা সমাজ কল্যাণ চিন্তার চেয়ে নিজের স্বার্থ-চিন্তাই প্রবল থাকে। *সাবীল* গল্পে এমনি পুণ্য আকাঙ্ক্ষী একটি পরিবারের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মহরমের সময় মানুষকে পানি খাওয়ালে বহুগুণ বেশি ছওয়াব পাওয়া যাবে বলে মিসেস আফজার বাড়ির পাশে সাবীল বসায়। কি কি কৌশল অবলম্বন করলে অধিক লোক তার সাবীল থেকে পানি পান করবে সে চিন্তায় সে ব্যস্ত থাকে।

ভোরের দিকটায় পানি খেতে কেউ আসে না বড়। দুপুরের দিকে কেউ কেউ আসে। সব মিলিয়ে দশ বারো গ্লাস পানির বেশী খরচ হয়না একদিনে। এমনি করে চার পাঁচ দিন যায়। একদিন মিসেস আফজার চাকরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, এখানে বাতাসা পাওয়া যায় না রে লালু?

— হ্যাঁ, পাওয়া যায়, আম্মা।

মিসেস আফজার পাঁচটা টাকা বের করে আনেন। চাকরকে টাকাটা দিয়ে বলেন,যা শিগগীর, পাঁচ টাকার বাতাসা নিয়ে আয়। এক গ্লাস পানি দিবি আর দুটো করে বাতাসা। দেখবি, পানি দিয়ে কুলোতে পারবি নে তখন। (সাবীল, মহাপতঙ্গ, পৃ. ১১০)

অথচ করাচির মরুময় এলাকায় প্রচণ্ড গরমে যখন পানির জন্য চারদিকে হাহাকার পড়ে যায়, তখন মিসেস আফজারকে ভিন্ন রূপে পাওয়া যায়। প্রচণ্ড গরমে বস্তীবাসীরা একটু খাবার পানির প্রত্যাশায় ছুটে আসে মিসেস আফজারের মত আরো অনেকের বাসায়। তৃষ্ণার্ত বস্তীবাসীদের কেউ একজন মিসেস আফজারের দরজায় খট খট শব্দ করে পানির জন্য। অথচ—

> মিসেস আফজার শুয়ে থাকেন চুপ মেরে। ...করুক না খট্ খট্ যতক্ষণ পারে। বাসার ভেতর যেন দীঘি কাটিয়ে রাখা হয়েছে আর কি। যে কেউ আসবে কলসী ভরে নিয়ে যাবে পানি। পানির জন্যে এ শহরে রীতিমত পয়সা দিতে হয়। (সাবীল, মহাপতঙ্গ, পৃ. ১১৩)

মিসেস আফজারের এ মানসিকতা রীতিমত বিস্ময়কর।

আবু ইসহাক তাঁর অধিকাংশ গল্প জুড়েই নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের কথা বললেও মাঝে-মধ্যে ভিন্ন প্রসঙ্গও নিয়েও তিনি গল্প রচনা করেছেন। *বংশধর*, *কনট্রাস্ট*, *বর্ণচোর* প্রভৃতি গল্পে ভিন্ন আবু ইসহাককে খুঁজে পাওয়া যায়। বাঙালি সমাজের ধারণা ছেলের মাধ্যমেই বংশ রক্ষা হয়। মেয়ে যতই থাকুক ছেলেই হল প্রকৃত বংশধর। *বংশধর* গল্পে লেখক এই প্রসঙ্গটি তুলে ধরেছেন বৃদ্ধ মালেক চৌধুরীর মাধ্যমে। মালেক চৌধুরী খুব হতাশ হয়ে পড়েন তার পুত্রের পর পর ছয়টি কন্যা সন্তান জন্ম নেয়ায়। তাঁর মনে হয় বংশধর না দেখেই একদিন হয়ত তাকে মত্যুবরণ করতে হবে। অবশেষে তাঁর ছেলের একটি পুত্র লাভ হলে তিনি নিশ্চিন্ত হন এবং ভাবেন এবার বংশ রক্ষা হল। মৃতপ্রায় মালেক চৌধুরী নাতির মুখ না দেখে মরতে চান না। তাঁর ছেলে দশ দিন পরে করাচি থেকে নাতিসহ দেশে ফিরবে এই খবর পাবার পর তাঁর অনুভূতি—

> আজ ভাদ্র মাসের দুই তারিখ। দশদিন মাত্র বাকী। এ দশদিন বাঁচব ত? বৃদ্ধের মনে সংশয় উঁকি-ঝুঁকি মারে। চিঠিটা গালের সাথে লাগিয়ে তিনি মনের জোর ফিরে পান। মনে মনে বলেন –নিশ্চয় বাঁচব। এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছেন আল্লাহ্। আর নাতির মুখ না দেখিয়ে নিয়ে যাবেন এখন? (বংশধর, মহাপতঙ্গ, পৃ. ৫৭)

আবু ইসহাকের গল্পগুলো বর্ণনাধর্মী। আঙ্গিক বা ভাষাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় গল্পকার আবু ইসহাকের সাফল্য হয়ত প্রশ্নাতীত নয়, কিন্তু গ্রামীণ জীবনের যে চিত্র তিনি তাঁর গল্পে উপস্থাপন করেছেন তা নিঃসন্দেহে বস্তুনিষ্ঠ। 'আবু ইসহাক তাঁর ছোটগল্পে প্রধানত নির্যাতিত ও শোষিত মানুষের পক্ষাবলম্বন করে সমাজ ও জীবনের ছবি অঙ্কন করেছেন। সেজন্য তাঁর লেখনী ধারায় সমাজের তথাকথিত অপাংক্তেয়রা অসাধারণ জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।'[১৪]

তথ্যপঞ্জি

১. আজহার ইসলাম, বাংলাদেশের ছোটগল্প-বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য, ঢাকা ১৯৯৬, পৃ. ১৯২

২. হারেম, ১ম প্রকাশ, ১৯৬২; গ্রন্থটিতে মোট গল্প সংখ্যা ১০টি

৩. মহাপতঙ্গ, ১ম প্রকাশ,সেপ্টেম্বর ১৯৬৩; গ্রন্থটিতে মোট গল্প সংখ্যা ১১টি

৪ অবশ্য নগর জীবনের চিত্রাঙ্কনেও তিনি অসফল নন। বর্ণচোর, প্রতিবিম্ব, সাবীল প্রভৃতি গল্পে তিনি নগর জীবন অঙ্কনে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

৫. বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলাদেশের ছোটগল্প, সাহিত্য পত্রিকা, ৩৬ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ.২০২

৬. মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, বাংলাদেশের ছোটগল্প জীবন ও সমাজ, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ.৪৩

৭. ঐ, পৃ. ৪৭

৮. ঐ, পৃ. ৪৭-৪৮

৯. জোঁক, মহাপতঙ্গ, ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৯৬৩।

১০. আজহার ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৪।

১১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ.২০২।

১১. মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ .৫০।

১২. মোহাম্মদ জয়নুদ্দিন, আবু ইসহাকের সাহিত্যভুবন, কালি ও কলম, ১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ.৬২

১৩. আজহার ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৫।